রিসালায়ে নূর সমগ্র থেকে নির্বাচিত

মু'জিযায়ে কুরআনিয়া

বদিউজ্জামান সাঈদ নূরসী

অনুবাদ
মামুন বিন ইসমাঈল

সোজলার পাবলিকেশন লিঃ
SOZLER PUBLICATION LTD.

রিসালায়ে নুর সমগ্র থেকে নির্বাচিত

মু'জিযায়ে কুরআনিয়া

বদিউজ্জামান সাঈদ নূরসী

অনুবাদ : মামুন বিন ইসমাঈল

প্রকাশকাল :
জানুয়ারি ২০২১ খ্রীস্টাব্দ।

প্রচ্ছদ ও বর্ণবিন্যাস :
মাসিক মদীনা গ্রাফিক্স সিস্টেমস
৩৮/২, বাংলা বাজার, ঢাকা-১১০০

প্রকাশক :
সোজলার পাবলিকেশন লিঃ
গিয়াস গার্ডেন বুকস্ কমপ্লেক্স, দোকান নং : ১১৮
৩৭ নর্থব্রুক হল রোড, বাংলাবাজার, ঢাকা।
মোবাইল : ০১৭৬৭৮২২০৬৪, ০১৬৭৬৫১৮৯৮৭
e-mail : sozlerpublicationltd@gmail.com
website : www.risalanur.org

MU'CİZÂT-I KUR'ÂNİYE
Bediuzzaman Said Nursi

Translated By : **Mamun Bin Ismail**

Publisher :
Sozler Publication Ltd.
Giyas Garden Books Complex, Shop No. : 118
37 North Brook Hall Road, Banglabazar, Dhaka.
Mobile : 01767822064, 01676518987
e-mail : sozlerpublicationltd@gmail.com
website : www.risalanur.org

মূল্য : ২৮০ (দুইশত আশি) টাকা মাত্র।

সূচীপত্র

বিষয়	পৃষ্ঠা নং
বদিউজ্জামান সাঈদ নূরসী ও রিসালায়ে নূর	৪
পঁচিশতম কালিমা মুজিযায়ে কুরআনিয়া	৮
প্রথম পরিচ্ছেদ	৪৩
দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ	৫১
দ্বিতীয় শোয়া	৫২
তৃতীয় শোয়া	৭৫
পরিসমাপ্তি	১৩৬
প্রথম পরিশিষ্ট	১৩৮
দ্বিতীয় পরিশিষ্ট বিশতম কালিমা	১৪৯
বিশতম কালিমা	১৫৮
খুবই গুরুত্বপূর্ণ একটি নুকতা এবং একটি রহস্য	১৭২
দুটি গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্নের দুটি গুরুত্বপূর্ণ জবাব	১৭৫
বারোতম কালিমা	১৭৯
সপ্তম লাম'আ	১৯৪
পরিশিষ্ট	২০২
কুরআনুল কারীমের সংক্ষিপ্ত বর্ণনা হলো কুরআনের মুজিযা	২০৫
তাওহিদের মহান দুটি প্রমাণ ও সূরা ইখলাসের অলৌকিকতার একটি পয়েন্ট	২১৪
এগারোতম শোয়ার ঈমানে ফলসমূহ, ঈমানের বিষয় দশম আলোচনা	২১৭

বদীউজ্জামান সাঈদ নূরসী ও রিসালায়ে নূর

বদীউজ্জামান সাঈদ নূরসী ১৮৭৬ সালে পূর্ব তুরস্কের বিতলীস প্রদেশের নূরস নামক গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। অনেক সংগ্রাম এবং ত্যাগ ও আত্মত্যাগের আদর্শ জীবন আমাদেরকে উপহার দিয়ে ১৯৬০ সালে ৮৪ বছর বয়সে উরফায় ইন্তেকাল করেন।

তিনি শীর্ষস্থানীয় একজন আলেম ছিলেন। প্রচলিত ধর্মীয় জ্ঞান ছাড়াও তিনি আধুনিক জ্ঞান-বিজ্ঞানে সমান পারদর্শী ছিলেন। যুবক বয়সেই তিনি শিক্ষা-দীক্ষায় অসাধারণ বুৎপত্তি লাভ করেন। অসাধারণ প্রতিভার প্রমাণ হিসেবে তাকে বদীউজ্জামান (কালের বিস্ময়) খেতাব দেয়া হয়।

বদীউজ্জামান সাঈদ নূরসীর জীবনকাল উসমানী খিলাফত, প্রথম বিশ্বযুদ্ধে তুরস্কের পতন ও বিভাজন, ১৯২৩ সালে তুরস্ক প্রজাতন্ত্র গঠন এবং এর পরবর্তী ৩৭ বছর -এই সময়কাল পর্যন্ত ব্যাপ্ত ছিল। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর থেকে ১৯২৩ সাল পর্যন্ত তিনি ইসলামের পথে মানবতার মুক্তির জন্য সংগ্রাম করেছেন। তিনি অগণিত ছাত্রকে শিক্ষাদান করেছেন। সমকালীন প্রথম সারির আলেম-ওলামাদের সঙ্গে বিভিন্ন ইসলামী কর্মকাণ্ডে জড়িত থাকা ছাড়াও পূর্ব-তুরস্কে রুশ-সৈন্যদের আক্রমণ প্রতিরোধে স্বেচ্ছাসেবক বাহিনীর নেতৃত্ব দান করেন। রুশদের বিরুদ্ধে দুই বছর যুদ্ধে সক্রিয় থাকার পর যুদ্ধাহত অবস্থায় তিনি বন্দী হন। বন্দীদশা থেকে অলৌকিকভাবে মুক্তিলাভের পর ইসলামের স্বার্থ সমুন্নত করার জন্য বিভিন্ন সামাজিক কর্মকাণ্ডে নিজেকে নিয়োজিত রাখেন।

যাই হোক, যে বছরগুলোতে উসমানী খেলাফত ভেঙ্গে প্রজাতন্ত্রে রূপ লাভ করে সেই বছরগুলোতেই তিনি 'পুরান সাঈদ' থেকে 'নতুন সাঈদ'-এ রূপান্তরিত হন।

'নতুন সাঈদ'-এ রূপান্তরিত হওয়ার অর্থ হলো, সামাজিক জীবন থেকে সরে গিয়ে অধ্যয়ন ও ইবাদত-বন্দেগীতে মগ্ন থাকা। এটাকে সেই সময়ের জন্য তার এক নতুন আধ্যাত্মিক সংগ্রামের প্রস্তুতি বলা যেতে পারে।

দুই বছর পর অর্থাৎ, ১৯২৫ সালে তৎকালীন শাসকগোষ্ঠীর ধর্মীয়

কর্মকাণ্ড ও দমন-নীতির বিরোধিতা করায় তাঁকে পশ্চিম আনাতোলিয়ায় নির্বাসিত করা হয় এবং এর পরের সাতাশটি বছর তাঁর জীবন শাসকগোষ্ঠীর নির্যাতন, হয়রানি ও কারাভোগে অতিবাহিত হয়। কিন্তু কারাদণ্ড ও নির্বাসনের বছরগুলোতেই প্রায় ছয় হাজার পৃষ্ঠার 'রিসালায়ে নূর' লিখিত হয় এবং সমগ্র তুরস্কে তা ছড়িয়ে পড়ে। সাঈদ নুরসী নিজেই বলেন, "এখন আমি স্পষ্টভাবে দেখতে পাচ্ছি যে, জীবনের অধিকাংশ সময়ই নিজের মেধা ও বুদ্ধিমত্তা, সক্ষমতা ও দূরদর্শিতা এবং উপলব্ধি ও ইচ্ছাশক্তির বাইরে এমনভাবে পরিচালিত হয়েছে যে, কোরআনের খেদমতের জন্যেই যেন এই বইগুলো লিখিত হয়েছে। জ্ঞানচর্চায় ব্যয় হওয়া আমার পুরো জীবনই যেন ছিল 'রিসালায়ে নূর' লেখার প্রাথমিক প্রস্তুতি মাত্র।"

মুসলিম বিশ্বের অধঃপতনের মূল কারণ যে ঈমানের ভিত্তি দুর্বল হয়ে যাওয়া -একথা বদীউজ্জামান সাঈদ নূরসী বুঝতে পেরেছিলেন। বস্তুবাদ ও ধর্মহীনতা এবং অন্য সকল শক্তির আক্রমণ এক হয়ে উনবিংশ ও বিংশ শতকে ঈমানের ভিত্তিকে দুর্বল করে দেয়ার অপচেষ্টায় ব্যস্ত হয়ে ওঠে। ফলে তাঁর এই ধারণা বদ্ধমূল হয় যে, ঈমানকে মজবুত করা এমনকি বাঁচিয়ে রাখাই বর্তমান সময়ের সবচেয়ে জরুরী ও প্রধান কাজ। সে সময়ের জন্য যা প্রয়োজন ছিল তা হচ্ছে ইসলামের ইমারতকে নিজ ভিত্তির উপর পূণঃর্নিমাণ করার জন্যে সবধরনের প্রচেষ্টা চালানো এবং লেখনীর জিহাদের মাধ্যমে সকল আক্রমণ প্রতিহত করা।

বদীউজ্জামান সাঈদ নূরসীর নির্বাসিত ও বন্দীজীবনে রচিত 'রিসালায়ে নূর' আধুনিক মানুষের কাছে ঈমানের মৌলিক বিষয় ও কোরআনের বাস্তব দিকগুলোর ব্যাখ্যা করে। তাঁর নিয়ম ছিল ঈমান ও কুফর দুটিকেই যুক্তির মাধ্যমে ব্যাখ্যা করা। তিনি এটাও করে দেখিয়েছেন যে, কোরআনের নিয়ম অনুরসণ করেই ঈমানের বাস্তবতা, আল্লাহর অস্তিত্ব ও একত্ববাদ, রেসালাত এবং স্বশরীরে পূণরুত্থান -এ সবই প্রমাণ করা সম্ভব। কারণ, এই সত্যগুলো বিশ্বজগত ও মানবকূলের সৃষ্টি ও অস্তিত্বেরও যথাযথ ব্যাখ্যা।

বিভিন্ন কাহিনী, উপমা, ব্যাখ্যা এবং জোরালো যুক্তির মাধ্যমে তিনি একথা প্রমাণ করেন যে, প্রকৃত দ্বীন আধুনিক বিজ্ঞানের সাথে সামঞ্জস্যহীন নয় বরং বিজ্ঞান ১৪শত বছর পরে এসেও কোরআনকে অনুসরণ করছে। বস্তুতঃ 'রিসালায়ে নূরে' তিনি এ কথাই প্রমাণ করেছেন

যে, বিশ্বজগতের কর্মকাণ্ড বিষয়ক বিজ্ঞানের শ্বাসরুদ্ধকর আবিষ্কার ইসলামের বাস্তবতাকে আরো মজবুত করে।

রিসালায়ে নূরের গুরুত্ব অতিরঞ্জিত করে বলার তেমন কোনো প্রয়োজন নেই। কারণ, বদীউজ্জামান সাঈদ নূরসী তুরস্কের ইতিহাসের অন্ধকার যুগে ইসলামী আকীদা ও ঈমানকে পূণর্জীবিত করেছেন। নিশ্চিতভাবে তাঁর এই ভূমিকার গুরুত্ব বর্তমান সময় পর্যন্ত ক্রমাগতভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে। এছাড়াও রিসালায়ে নূর শুধুমাত্র যে মুসলমানদের সমস্যার সমাধান দেয় তাই নয় বরং সকল মানুষের জন্যেও এগুলো কয়েকটি কারণে অনেক গুরুত্বের দাবিদার।

প্রথমতঃ "রিসালায়ে নূর" লেখা হয়েছে আধুনিক চিন্তা-চেতনা ও ধ্যান-ধারণার প্রতি লক্ষ্য রেখে, যে ধ্যান-ধারণা মুসলিম-অমুসলিম নির্বিশেষে জড়বাদী দর্শনে আচ্ছন্ন যে কোনো ব্যক্তির মনে যেসব বিভ্রান্তি, সন্দেহ ও প্রশ্নের জন্ম দেয়, 'রিসালায়ে নূর' তার সঠিক উত্তর দিতে সক্ষম। আধুনিক চেতনা-সম্পন্ন মানুষের মনের যে সকল প্রশ্ন "কি, কেন, কিভাবে" এই সকল প্রশ্নেরও উত্তর দিয়ে দেয়।

'রিসালায়ে নূর' ঈমানের সুগভীর বিষয়বস্তু স্বাভাবিকভাবে মানুষের জন্য এমন সহজ সরল পদ্ধতিতে ব্যাখ্যা করে যে, নবীনেরাও তা বুঝতে পারে এবং ফায়দা লাভ করতে পারে। অথচ ইতিপূর্বে এ সূক্ষ্ম ও সুগভীর বিষয়ে শুধুমাত্র বিজ্ঞ আলেমগণই পড়াশোনা করতেন। বিশ্বজগত এবং মানুষের প্রকৃত উদ্দেশ্য ব্যাখ্যা করতে গিয়ে সাঈদ নূরসী রিসালায়ে নূরে এ কথা প্রমাণ করেন যে, প্রকৃত সুখ ঈমান এবং আল্লাহর পরিচয় লাভের মাঝেই নিহিত। তিনি এও দেখিয়ে দিয়েছেন, যেই অশান্তি ও যন্ত্রণা কুফরের মাধ্যমে জন্ম নিয়ে মানুষের রূহ্ এবং কুলবকে আচ্ছন্ন করে তা শুধুমাত্র প্রকৃত ঈমান দ্বারাই দূর হওয়া সম্ভব।

পবিত্র কোরআন মানুষের বিবেক-বুদ্ধিকে সম্বোধন করে। এই প্রজ্ঞাময় মহাগ্রন্থ মহাবিশ্ব এবং মহাবিশ্বের অবিরাম গতিময়তা ও পরিবর্তনশীলতার প্রতি মানুষের দৃষ্টি আকর্ষণ করে, যাতে করে মানবজাতি সৃষ্টিজীব হিসেবে নিজের দায়িত্ব ও কর্তব্য অনুধাবন করতে পারে। "রিসালায়ে নূরে" সাঈদ নূরসী শিক্ষাদানের এই পদ্ধতিই অনুসরণ করেছেন।

তিনি মহাবিশ্বের প্রকৃত রূপকে মহান স্রষ্টার নিদর্শন হিসেবে ব্যাখ্যা করেছেন। তিনি অকাট্য যুক্তির মাধ্যমে দেখিয়েছেন যে, পূর্বোক্ত ব্যাখ্যার

আলোকে এই আয়াতগুলো যদি পাঠ করা হয় তাহলে ঈমানের মৌলিক বিষয়ের বাস্তবতা সুস্পষ্ট হয়ে উঠে। এ পদ্ধতি অনুসরণের মাধ্যমে মানুষ প্রকৃত ও মজবুত ঈমানের এমন স্তরে পৌছতে সক্ষম হয়- যা প্রকৃতিবাদ, জড়বাদ ও অবিশ্বাসের সূক্ষ্ম বেড়াজাল থেকে উদ্ভূত সংশয়ের মোকাবেলা করতে সক্ষম। বৈজ্ঞানিক ও প্রযুক্তিগত সকল উন্নতি-অগ্রগতির অর্থ হচ্ছে নিখিল বিশ্বের দ্বার উন্মোচন করা।

এই বিশ্বজগতকে যদি বিশাল এক গ্রন্থরূপে দেখা হয়- যার প্রতিটি অক্ষর গ্রন্থ প্রণেতার প্রতি ইশারা করে, তাহলে তা ঈমানের বুনিয়াদকে শুধু মজবুতই করবে না, বরং তাকে গভীর ও সম্প্রসারিতও করবে। মানুষের মৌলিক চাহিদা হচ্ছে এমন এক ধর্ম বিশ্লেষন- যার মাধ্যমে সে মহান স্রষ্টা আল্লাহ্‌কে তাঁর সকল সুন্দরতম নাম ও গুণাবলীসহ চিনতে পারে। "রিসালায়ে নূর" মানুষের কাছে তার স্রষ্টার পরিচিতি সহজ ও সাবলীলভাবে উপস্থাপন করে। এটা মুসলমানদেরকে শুধু অনুকরণের ঈমান থেকে "বিশ্লেষণের" ঈমানের দিকে ধাবিত করে। অমুসলিমদেরকে সৃষ্টির উপাসনা থেকে স্রষ্টার ইবাদতের দিকে আহ্বান করে। মহাপ্রজ্ঞাময় কোরআনের পথ দেখায়।

"রিসালায়ে নূর" প্রচলিত তাফসীর গ্রন্থাবলি থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন আঙ্গিকের একটি তাফসীরগ্রন্থ। এটা কোরআনের সকল আয়াতের তাফসীর নয় বরং কোরআন ও হাদীসের আলোকে বিংশ ও একবিংশ শতাব্দীর আধুনিক চিন্তা-চেতনার মানুষের সকল প্রশ্নের জবাব দেয়।

"রিসালায়ে নূর" কতগুলো গ্রন্থের সমষ্টি। এ গ্রন্থগুলোর মধ্য থেকে আল-কালিমাত গ্রন্থের পঁচিশতম কালিমাতের বঙ্গানুবাদ হচ্ছে এই পুস্তক।

তাই আমরা বাংলাদেশের মানুষের উপকারে আসবে মনে করেই কুরআনের মুজিযার উপর লিখিত এই পঁচিশতম কালিমাতের বাংলা অনুবাদ সম্পন্ন করার প্রয়াস পাই। যদিও কোনো বইয়ের অনুবাদে ঐ মূল বইয়ের হুবহু তুলে ধরা সম্ভব হয়নি- তবুও আমরা এ ব্যাপারে সাধ্যমত চেষ্টা করেছি। পরিশেষে "রিসালায়ে নূরের" প্রত্যেকটি শব্দ ও বাক্যকে গভীরভাবে অনুধাবন করে পাঠ করার জন্য সকলের প্রতি সবিনয় অনুরোধ রইল।

পঁচিশতম কালিমা
মুজিযায়ে কুরআনিয়া

যখন আমার হাতে কুরআনুল কারিমের মতো চিরন্তন শাশ্বত মুজিযা রয়েছে, তখন আমি সত্য সম্পর্কে অন্য কোনো দলিল-প্রমাণ অনুসন্ধান করা অহেতুক ও অনর্থক মনে করি।

আমার হাতে কুরআনের মতো বাস্তব সত্য প্রমাণ থাকলে নাস্তিক খোদাদ্রোহী অস্বীকারকারীদের দলিল-প্রমাণ খণ্ডণ করতে এবং তাদেরকে নিরুত্তর করতে কোনো বেগ পেতে হবে কি?

সতর্কতা

আমি এই পঁচিশতম কালিমার শুরুতে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ ছিলাম যে, এই কালিমাতে পাঁচটি শুলা অন্তর্ভুক্ত করব। প্রথম শুলা শেষ করে বাকিগুলো দ্রুত লিখে শেষ করতে বাধ্য হয়েছি। কারণ, এই গ্রন্থকে পুরোনো বর্ণলিপিতে (আরবি বর্ণলিপিতে) প্রকাশ করতে হবে। তাই কয়েকদিন দৈনিক দুই-তিন ঘণ্টায় ২০-৩০ পৃষ্ঠা লিখতাম। এই জন্য তিনটি শুলা লিখেই শেষ করে দিয়েছি। সংক্ষিপ্ত আকারে এবং ছোট্টো কলেবরে লিখেছি। আর দুটি শুলা ছেড়ে দিয়েছি। সম্মানিত পাঠক ভাইদের নিকট নিবেদন যে, আমার থেকে যে সকল ভুল-ভ্রান্তি ও দোষ-ত্রুটি হয়ে গেছে, সেগুলো ক্ষমাসুন্দর দৃষ্টিতে দেখবেন এবং নিরপেক্ষ দৃষ্টিতে অবলোকন করবেন।

এই মুজিযায়ে কুরআনিয়া নামক অধ্যায়ে এমন আয়াতকেই সংযোজিত করা হয়েছে, যেগুলো নাস্তিক- খোদাদ্রোহীরা সমালোচনার কেন্দ্রবিন্দু বানিয়েছে। আধুনিক জ্ঞান-বিজ্ঞানের অনুসারীরা সমালোচনার লক্ষ্যস্থল বানিয়েছে অথবা মানব ও জিনরূপী-শয়তানের দ্বিধা-সংশয় ও প্রশ্ন-আপত্তির কেন্দ্রবিন্দু হয়ে গিয়েছে। এই পঁচিশতম কালিমার মধ্যে অনেক আয়াত রয়েছে। এর মধ্যে অনেক হাকিকত ও বাস্তবতা এবং সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম তত্ত্ব উৎকৃষ্ট পদ্ধতিতে বর্ণিত হয়েছে। এমনিভাবে আধুনিক জ্ঞান-বিজ্ঞানের প্রবক্তা ও নাস্তিক খোদাদ্রোহীরা যেই আয়াতগুলো দিয়ে

কুরআনকে দুর্বল ও নড়বড়ে হওয়া সাব্যস্ত করে সেগুলোর ব্যাপারে এই গ্রন্থ বিজ্ঞানসম্মত নিয়মনীতি দ্বারা এ কথা সাব্যস্ত করেছে যে, এগুলোই কুরআনুল কারিমের বাগ্মিতার উৎসমূল এবং ইজায ও অলৌকিকত্বের ঝলক।

কিছু প্রশ্ন-আপত্তি ও সংশয়-সন্দেহের অকাট্য প্রমাণ পেশ করা হয়েছে। তবে পৃথকভাবে সেই সংশয়-সন্দেহের উল্লেখ করা হয়নি। এটা এজন্য যেন কারো চিন্তাশক্তি ও মনমস্তিষ্ক নোংরা না হয়ে যায়। যেমন : কিছু আয়াত হলো-

وَالشَّمْسُ تَجْرِى • وَالْجِبَالَ أَوْتَادًا

তবে বিশতম কালিমার প্রথম অধ্যায়ের মধ্যে কিছু আয়াত-সংক্রান্ত তাদের প্রশ্ন-আপত্তি ও সংশয়-সন্দেহ উল্লেখ করেছি।

মুজিযায়ে কুরআনিয়া অধ্যায়টি যদিও খুব সংক্ষেপে ও তাড়াহুড়ো করে লেখা হয়েছে। তবে এর মধ্যে সাহিত্যালংকারের দিক ও আরবি জ্ঞান-বিজ্ঞান সুদৃঢ় তাত্ত্বিক পদ্ধতিতে এবং গভীরভাবে সুস্পষ্ট বর্ণনা করা হয়েছে- যা আলিমগণকে বিমুগ্ধ ও বিমোহিত করেছে। এই গ্রন্থের প্রত্যেকটি আলোচনা সকল অনুরাগী পাঠক যথাযথভাবে আয়ত্ত করতে পারবে না এবং এর থেকে পরিপূর্ণ উপকারিতা অর্জন করতে পারবে না। তবে প্রত্যেকেই এই ফলবান বাগান থেকে নিজের জন্য প্রয়োজনীয় ও গুরুত্বপূর্ণ অংশ আহরণ করে নিতে পারবে। এই গ্রন্থটি যদিও গোলযোগপূর্ণ পরিস্থিতিতে সংকলন করা হয়েছে এবং তাড়াহুড়ো করে লেখা হয়েছে। সেইসঙ্গে আলোচনা ও অভিব্যক্তি প্রকাশের ক্ষেত্রে ভুল-ত্রুটি থেকে যাওয়া অস্বাভাবিক কিছু নয়। তবে এরপরেও ইল্‌ম ও তত্ত্বের দৃষ্টিকোণ থেকে অনেক গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের বহু হাকিকত ও বাস্তবতা এতে সন্নিবেশিত হয়েছে।

সাঈদ নুরসী

মুজিযায়ে কুরআনিয়া

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

قُلْ لَئِنِ اجْتَمَعَتِ الْاِنْسُ وَالْجِنُّ عَلٰٓى اَنْ يَّاْتُوْا بِمِثْلِ هٰذَا الْقُرْاٰنِ لَا يَاْتُوْنَ بِمِثْلِهٖ وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيْرًا

কুরআনুল হাকিম, যা অসংখ্য মুজিযার উৎস এবং রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের মহান মুজিযা, আমি এই কুরআনুল হাকিমের অসংখ্য ইজায ও অলৌকিকত্বের প্রায় ৪০টি দিকের প্রতি ইশারা করেছি। এই আরবি গ্রন্থ, আরবি রিসালায়ে নুর, ইশারাতুল ইজায এবং পূর্ববর্তী চব্বিশটি কালিমার মধ্যে ইশারা করেছি। এই পুস্তিকার মধ্যে পাঁচটি দিকের প্রতি ইশারা করব। সেগুলোকেই একটু বিস্তারিতভাবে আলোচনা করব। সবগুলোই এখানে সংক্ষেপে উল্লেখ করব। ভূমিকা অংশে কুরআনুল কারিমের সংজ্ঞা ও বৈশিষ্ট্যের আলোচনা করব।

ভূমিকা

ভূমিকায় তিনটি আলোচনা সংযোজিত হয়েছে।

প্রথম আলোচনা : কুরআনুল কারিম কী? কুরআনুল কারিমের পরিচিতি কী? উনিশতম কালিমায় সুস্পষ্টভাবে বর্ণনা করা হয়েছে এবং আরও অন্যান্য গ্রন্থে এ কথা প্রমাণ করা হয়েছে যে, কুরআন হলো- এই সৃষ্টিজগৎ নামক মহাগ্রন্থের শাশ্বত মুখপত্র...

* সৃষ্টিজগতের নিদর্শনসমূহের বর্ণনাকারী বহুভাষার চিরন্তন মুখপত্র...
* অদৃশ্যজগৎ ও প্রত্যক্ষজগৎ নামক গ্রন্থের ব্যাখ্যাকার
* দৃশ্য ও অদৃশ্যজগৎগ্রন্থের ব্যাখ্যাকার...
* কুরআনুল কারিম হলো আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীর পাতায় পাতায় লুকায়িত আসমাউল হুসনার আধ্যাত্মিক গুপ্ত ভান্ডারের উন্মোচক...
* কুরআনুল কারিম হলো ঘটনার লাইনে লাইনে লুকায়িত প্রকৃত অবস্থার চাবি...

* কুরআনুল কারিম হলো প্রত্যক্ষ জগতে অদৃশ্য জগতের ভাষা...
* কুরআনুল কারিম হলো এই দৃশ্যমান জগতের পর্দার আড়ালে লুকায়িত অদৃশ্যজগৎ থেকে আগত সুমহান সত্তার চিরন্তন সম্বোধন এবং আল্লাহর শাশ্বত মনোযোগ ও দৃষ্টির ভান্ডার...
* কুরআনুল কারিম হলো ইসলামের আধ্যাত্মিক জগতের সূর্য, ভিত্তি ও প্রকৌশল.....
* কুরআনুল কারিম হলো আখিরাত-জগতের পবিত্র মানচিত্র....
* কুরআনুল কারিম হলো আল্লাহর সত্তা, গুণ, নাম এবং তাঁর কার্যাবলির সমুজ্জ্বল মুখপত্র, অকাট্য প্রমাণ, সুস্পষ্ট ব্যাখ্যা এবং ব্যাখ্যাকার বাণী....
* এমনিভাবে কুরআনুল কারিম হলো এই মানবজগতের অভিভাবক....
* বৃহৎ মানবতা তথা ইসলামের আলো ও পানিসদৃশ এই কুরআনুল কারিম....
* এমনিভাবে কুরআনুল কারিম হলো মানবশ্রেণীর প্রকৃত দর্শন....
* কুরআনুল কারিমই হলো, প্রকৃত পথপ্রদর্শক যা মানবজাতিকে মহাসৌভাগ্যের পথ দেখায়...
* কুরআনুল কারিম মানুষের জন্য যেমনিভাবে শরিয়ত, তেমনিভাবে হিকমতের গ্রন্থ... যেমনিভাবে দুআ ও ইবাদতের গ্রন্থ, তেমনিভাবে নির্দেশ ও দাওয়াতের গ্রন্থ.... এবং যেমনিভাবে জিকিরের গ্রন্থ, তেমনিভাবে চিন্তা ও গবেষণার গ্রন্থ....
* যে সকল গ্রন্থ মানুষের আধ্যাত্মিক সকল প্রয়োজন পূরণ করে, সেই গ্রন্থসমূহের সমন্বয়ক একক অনন্য পবিত্র গ্রন্থ এই কুরআনুল কারিম।
* এমনকী এই কুরআনুল কারিম অলি-আওলিয়া, সিদ্দিকিন, আরেফ বিল্লাহ ও মুহাক্কিকগণের বিভিন্ন মত-পথ ও অনুসৃত পথের এমন এক পয়গাম প্রকাশ করেছে- যা ওই মত-পথের রুচিবোধের অনুকূলে সেটাকে উজ্জ্বলতা দান করে এবং ওই মতপথকে উন্নতি অগ্রগতি প্রদানের ক্ষেত্রে সবিশেষ সহায়ক। যেন এই আসমানি গ্রন্থ এমন এক পবিত্র গ্রন্থাগারের সাথে সাদৃশ্য রাখে- যা অসংখ্য অগণিত গ্রন্থের সমাহারে সমৃদ্ধ।

দ্বিতীয় অলোচনা : কুরআনের পরিচিতির উপসংহার

বারোতম কালিমার মধ্যে সুস্পষ্টভাবে বর্ণনা করা হয়েছে এবং প্রমাণ করা করা হয়েছে যে, কুরআনুল কারিম আরশে আজিম থেকে, ইসমে আজম

থেকে এবং আসমাউল হুসনার প্রত্যেকটি নামের সুমহান স্তর ও অবস্থান থেকে অবতীর্ণ হয়েছে।

কুরআনুল কারিম জগৎসমূহের রবের পক্ষ থেকে আল্লাহর বাণী।

* সৃষ্টিজগতের ইলাহ হিসেবে আল্লাহর নির্দেশনামা। আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীর স্রষ্টা হিসেবে আল্লাহর সম্বোধন।

* রুবুবিয়্যাতে মুতলাকা তথা একচ্ছত্র ও নিরঙ্কুশ প্রভুত্ব হিসেবে সুমহান কথোপকথন।

* কুরআনুল কারিম আল্লাহর সুমহান সর্বময় রাজত্বের নামে চিরন্তন সম্ভাষণ।

* কুরআনুল কারিম আল্লাহর সর্বব্যাপী রহমতের দৃষ্টি ও মনোযোগ এবং মান-মর্যাদার খাতা ও তালিকা।

* কুরআনুল কারিম আল্লাহর গ্রন্থসমগ্রের সমষ্টি- যা সুমহান উলুহিয়্যাতকে বর্ণনা করে। কেননা, কোনো কোনোটার শুরুটা সংকেত ও ইশারা এবং কোড ও সংকেতলিপি।

* এই কুরআনুল কারিমই হলো পবিত্র গ্রন্থ- যা জ্ঞান ও প্রজ্ঞা বিচ্ছুরণ করে। ইসমে আজমের মহাসমুদ্র থেকে অবতীর্ণ এবং কুরআনুল কারিম সেই সব বিষয়ের দিকে চেয়ে থাকে- যা আরশে আজিম পরিবেষ্টন করে আছে।

এই রহস্যের কারণেই কুরআনকে কালামুল্লাহ বলা হয়। কুরআন সর্বদা এই নামেরই যোগ্য ও উপযুক্ত। কুরআনের পরের স্তরে হলো সকল নবি-রাসুলের পবিত্র গ্রন্থাবলি এবং তাঁদের সহিফাসমূহ। আর আল্লাহর অসংখ্য অগণিত অফুরন্ত কথা ও বাণীর কতকগুলো ইলহাম আকারে, বিশেষ রহমতে, বিশেষ রাজত্বে, বিশেষ রুবুবিয়াতে, বৈশিষ্ট্যপূর্ণ নামের বিশেষ তাজাল্লিতে, বিশেষ শিরোনামে এবং বিশেষভাবে প্রকাশ পায়। আর ফেরেশতা, মানুষ ও প্রাণীর ইলহামগুলো [০১] বিভিন্ন ধরনের, সামগ্রিক ও বৈশিষ্ট্যগত দিক থেকে ভিন্ন ভিন্ন হয়ে থাকে।

তৃতীয় অলোচনা

কুরআনুল কারিম এমন এক আসমানি গ্রন্থ- যা বিভিন্ন যুগের সকল নবি-রাসুলের গ্রন্থসমূহকে বিভিন্ন মতপথের সকল অলি-আওলিয়ার

০১. ইলহাম : অন্তরে ঐশী অনুপ্রেরণা। -অনুবাদক

বিভিন্ন গ্রন্থকে এবং বিভিন্ন অনুসারীর সকল সুফি-সাধকের নিদর্শনসমূহকে অন্তর্ভুক্ত করে। কুরআনুল কারিমের ছয় দিক আলোকিত, সমুজ্জ্বল, অমূলক ধারণার আঁধার থেকে মুক্ত এবং দ্বিধা-সংশয়ের সম্ভাবনা থেকে পবিত্র। কেননা, কুরআনুল কারিমের ভরসা ও নির্ভরতার কেন্দ্রবিন্দু হলো, সুনিশ্চিতভাবে আসমানি ওহি এবং কালামে আজালি।

এর লক্ষ-উদ্দেশ্য হলো- প্রত্যক্ষ চিরন্তন সুখ-সৌভাগ্য।

এর অন্তর্ভুক্ত বিষয় হলো- সুস্পষ্ট নির্ভেজাল হিদায়াত।

এর ওপরে রয়েছে, আবশ্যিকভাবে ঈমানের নূর ও আলো।

এর নিচে রয়েছে, সুনিশ্চিত বিশ্বাসের সাথে দলিল ও প্রমাণ।

এর ডানে রয়েছে, অভিজ্ঞতার আলোকে আবেগ-অনুভূতি ও অন্তরকে সমর্পণ।

এর বাঁয়ে রয়েছে, সুদৃঢ় বিশ্বাসের সাথে বুদ্ধি ও বশ্যতার আনুগত্য।

এর ফলাফল হলো, সুদৃঢ় আস্থার সাথে রহমানের রহমত ও জান্নাতের বাসস্থান লাভ।

এর অবস্থান ও মর্যাদা হলো সত্য বিশ্বাসের সাথে ফেরেশতা, মানুষ ও জিন জাতি একে গ্রহণ করে নেওয়া এক আসমানি গ্রন্থ।

তিনটি আলোচনায় কুরআনুল কারিমের পরিচিতির মধ্যে উল্লিখিত গুণাবলির প্রত্যেকটাকেই বিভিন্ন স্থানে অকাট্য অখণ্ডনীয়ভাবে প্রমাণ করা হয়েছে। কিছু সামনে প্রমাণ করা হবে। আমাদের এই দাবি ভিত্তিহীন দাবি নয়; বরং প্রত্যেকটিই অকাট্য দলিল-প্রমাণ দ্বারা প্রমাণিত।

প্রথম শুউলা

এই অধ্যায়ের মধ্যে তিনটি শোয়া রয়েছে

প্রথম শোয়া

কুরআনুল কারিমের সাহিত্যালংকার মুজিযাময় ও অলৌকিক

এই মুজিযাময় সাহিত্যালংকার কুরআনুল কারিমের যথার্থ বিন্যাস ও সুনিপুণ গ্রন্থনা থেকে, অভিনব চমৎকার ও উৎকৃষ্ট ভাষাশৈলী থেকে, উন্নত উৎকৃষ্ট ও অনুপম বর্ণনা থেকে, সুদৃঢ় ও সুপ্রতিষ্ঠিত অর্থ ও মর্ম থেকে এবং সাবলীল ও আলংকারিক শব্দাবলি থেকে উৎসারিত হয়েছে। এই অলৌকিক ভাষাসাহিত্যের কারণেই মানবসন্তানের বিদগ্ধ সাহিত্যিক,

শ্রেষ্ঠ বাগ্মিক এবং সুপণ্ডিতগণকে সুদীর্ঘ তেরোশত বছর [০২] যাবৎ চ্যালেঞ্জ করে আসছে। কিন্তু তারা কখনো এর মোকাবিলায় আসেনি। কুরআন তাদেরকে কঠোরভাবে চ্যালেঞ্জ করা সত্ত্বেও তারা সামান্য কথাও বলেনি; বরং তারা রীতিমতো লজ্জায় মাথা নত করে রেখেছিল। এবং লাঞ্ছনায় তাদের মস্তক ছিল অবনত। অথচ তাদের মধ্যে কালজয়ী বাগ্মিক সাহিত্যিক ছিলেন; যারা অহংকারে ছিলেন পর্বতসম।

কুরআনের মুজিযাময় সাহিত্যালংকারকে দুভাবে ইশারা করব-

প্রথম : কুরআনের অলৌকিকতা আছে এবং তা বিদ্যমান। কেননা, আরবদ্বীপের অধিকাংশ বাসিন্দাই সে সময়ে উম্মি (নিরক্ষর) ছিল। এই জন্যই তারা নিজেদের গৌরবগাঁথা কীর্তি, ঐতিহাসিক ঘটনাবলি, প্রবাদ-প্রবচন, হেকমত-দর্শন এবং তাদের উৎকৃষ্ট গুণাবলি লেখার পরিবর্তে কাব্যাকারে এবং মুখে মুখে প্রচলিত সাহিত্যিক কথামালার মধ্যে সংরক্ষিত করে রেখেছে। এই মর্মপূর্ণ প্রাজ্ঞিক বাণী ও কথামালা স্মৃতিশক্তির মধ্যে সুস্থিত হয়ে থাকত এবং লোক পরম্পরায় সেগুলো বর্ণনা হতে থাকে। তাদের মধ্যে এই স্বভাবজাত চাহিদা-ই তাদেরকে বাজারের সবচে' প্রিয় ও সর্বাধিক প্রচলিত সামগ্রী 'সাহিত্যালংকার ও ভাষা-অলংকার' বানাতে বাধ্য করেছে। এমনকী একজন বাগ্মিক সাহিত্যিককে নিজের গোত্রের গর্ব ও গৌরবের প্রতীক এবং মর্যাদা ও সম্মানের মহানায়ক মনে করা হয়। এই গোত্রপতিগণই ইসলামি যুগে নিজ বুদ্ধিমত্তা দ্বারা বিশ্বকে নেতৃত্ব দিয়েছে। তারাই পরবর্তী সময়ে জগতের বিভিন্ন জাতিসমূহের মাঝে সাহিত্যালংকারের ক্ষেত্রে নেতৃত্ব ও উচ্চাসনে সমাসীন ছিলেন। তখন সাহিত্যালংকারের প্রচলন ছিল। সে সময় এর প্রয়োজনীতাও ছিল খুব বেশি। এটাকেই তাঁরা নিজেদের মান-মর্যাদার কেন্দ্রবিন্দু মনে করে। বরং এমন কথা দ্বারাই যুদ্ধের চাকা দু'গোত্রের মাঝে আবর্তিত হতো অথবা দুই গোত্রের মাঝে শান্তিচুক্তি হতো, যা তাদের সুসাহিত্যিকদের থেকে প্রকাশ হতো; বরং তারা তো নিজেদের শ্রেষ্ঠ কবিদের সাতটি কবিতাকে স্বর্ণের কালি দ্বারা লিখে সেটাকে কাবার দেয়ালে ঝুলিয়ে রেখেছিল। এটাকে মুআল্লাকাতে সাবআ বলা হয়। এটাকে তারা নিজেদের গর্বের প্রতীক মনে করে।

০২. বর্তমানে চোদ্দোশত বছর। -বাংলা অনুবাদক

যেই সময়ে সাহিত্যালংকার মর্যাদার উচ্চ শিখরে পৌঁছে গেছে এবং সবার নিকট বিশেষ আকাঙ্ক্ষিত হয়ে গেছে সেই সময়েই কুরআনুল মুজিযুল বয়ান অবতীর্ণ হয়েছে। যেমন : হজরত মুসা আ. ও ঈসা আ.-এর যুগে যথাক্রমে জাদুবিদ্যা এবং চিকিৎসাবিদ্যার প্রচলন ছিল। তাই এই নবিদ্বয়কে সেই ধরনের মুজিযা প্রদান করা হয়েছিল। ঠিক তেমনিভাবে এই সময়ের মধ্যে কুরআনুল কারিম অবতীর্ণ হয়েছে নিজ সাহিত্যালংকার নিয়ে, তার যুগের এবং পরবর্তী সকল যুগের সাহিত্যালংকারকে চ্যালেঞ্জ করেছে। আরব সাহিত্যিকদের কুরআনের মোকাবিলা করতে এবং ছোট্ট কোনো সূরার অনুরূপ রচনা করতে আহ্বান করেছে এবং বলছে-

وَإِنْ كُنْتُمْ فِي رَيْبٍ مِمَّا نَزَّلْنَا عَلَى عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِنْ مِثْلِهِ

এই আয়াত দিয়ে চ্যালেঞ্জকে আরও প্রবল করেছে। ঈমান না আনো তাহলে অভীশপ্ত হবে, জাহান্নামে প্রবেশ করবে। বলে কঠিনভাবে তাদের আত্মসম্মানবোধকে আঘাত করে এবং এটা তোমাদের নিকৃষ্ট বাসস্থান। এই চ্যালেঞ্জ তাদের অহংকারকে চূর্ণ-বিচূর্ণ করে দিয়েছে। তাদের জ্ঞান-বুদ্ধিকে হেয় করেছে। তাদের স্বপ্নকে নির্বোধ সাব্যস্ত করেছে। পৃথিবীতে তাদেরকে মৃত্যুদণ্ডাদেশ দিয়েছে; যেমন আখিরাতে তাদের দেওয়া হবে। অর্থাৎ তোমরা কুরআনের অনুরূপ কোনো কিছু রচনা করো, নয়তো তোমাদের জীবন ও সম্পদ ঝুঁকির মধ্যে নিক্ষেপ করো; যতদিন পর্যন্ত তোমরা কুফরিতে অটল থাকবে।

এভাবে কুরআনের মোকাবিলা যদি সম্ভব হতো, তাহলে তারা কি কুরআনের দাবি ও চ্যালেঞ্জকে খণ্ডন করার জন্য অনুরূপ কয়েকটি আয়াত রচনা করার পথকে সামনে রেখে অধিক ঝুঁকিপূর্ণ ও কষ্টদায়ক পথ তথা যুদ্ধ ও বিনাশের পথকে অবলম্বন করত?

হ্যাঁ, অবশ্যই যে সকল মেধাবী প্রতিভাবান ব্যক্তিবর্গ নিজেদের রাজনীতি ও বুদ্ধিমত্তা দ্বারা একসময় জগৎকে পরিচালনা করেছেন, তারা কি নিরাপদ ও সহজতম পন্থা পরিত্যাগ করতে পারতেন? এবং যে পথে তাদের জীবন ও ধন-সম্পদ ধ্বংস ও বিনাশের মুখোমুখি, তারা কি সে পথ অবলম্বন করবে? কেননা, কয়েকটি বাণী-সমষ্টি দিয়ে যদি সেই সকল সাহিত্যিক কুরআনের মোকাবিলা করতে সক্ষম হতো, তাহলে কুরআন নিজের দাবি থেকে সরে যেত এবং আরবরাও আধ্যাত্মিক ও জাগতিক বিনাশ থেকে মুক্তি পেয়ে যেত। অথচ তারা সুদীর্ঘ ভয়ংকর

যুদ্ধের পথ অবলম্বন করেছে। এর অর্থ হলো বর্ণমালার দ্বারা মোকাবিলা করা সম্ভব নয় এবং তাদের জন্য কোনো অবস্থাতেই এর মোকাবিলা করা সম্ভব নয়। এই জন্যই তারা তরবারি দ্বারা যুদ্ধ-বিগ্রহের আশ্রয় নিয়েছে। এর পরেও কুরআনের মোকাবিলা করা এবং অনুরূপ কোনো কিছু রচনা করার আরও সুদৃঢ় দুটি কারণ রয়েছে। সে দুটি হলো-

এক. কুরআনের মোকাবিলা করতে শত্রুদের আগ্রহ থাকা।

দুই. কুরআন অনুসরণ-অনুকরণে বন্ধুদের আসক্তি ও ভালোবাসা।

এই দুটি প্রবল ঝোঁক ও টানের কারণেই মিলিয়ন মিলিয়ন গ্রন্থ আরবি ভাষায় রচিত হয়েছে। কিন্তু এর মধ্যে কোনো একটি গ্রন্থ কখনোই কুরআনের অনুরূপ বা সাদৃশ্য হতে পারেনি। কেননা, জ্ঞানী হোক বা মূর্খ- যেই এই গ্রন্থগুলোকে দেখে, সে-ই বলে, কুরআন এই ধরনের গ্রন্থাবলির মতো নয়। এসব গ্রন্থ কখনোই কুরআনের মোকাবিলা করতে পারবে না। তাই হয়তো এমন হবে যে, কুরআনুল কারিম অন্য সকল গ্রন্থের সাহিত্যালংকারের কাছাকাছি। আর এ কথা মিথ্যা, অমূলক, অবাস্তব ও অসম্ভবও বটে। শত্রু-মিত্র সকলেই এ ব্যাপারে একমত। নয়তো এমন হবে যে, কুরআনুল কারিম এই সকল গ্রন্থের ঊর্ধ্বে, সুমহান ও সমুন্নত। আর এটাই বাস্তব।

প্রশ্ন : তুমি যদি প্রশ্ন করো, আমরা কীভাবে জানব যে কুরআনের মোকাবিলা করতে কেউ-ই কখনো উদ্যোগী হয়নি? কেউ-ই কি কখনো চ্যালেঞ্জের ফিল্ডে আসার জন্য নিজের ওপর, নিজের যোগ্যতার ওপর আস্থা-ভরসা করতে পারেনি? তাদের পারস্পরিক সমর্থন-সহযোগিতা কি তাদের কোনো উপকারে আসেনি?

উত্তর : মোকাবিলা করা যদি সম্ভবই হতো, তাহলে চেষ্টা-উদ্যোগ তো দৃষ্টিগোচর হতো-ই। কেননা, মোকাবিলা করাটা ছিল মান-মর্যাদা এবং গর্ব ও গৌরবের বিষয়। এবং জীবন ও সম্পদ নিঃশেষ হওয়ার বিষয়। মোকাবিলা যদি সম্ভব হতো-ই, তাহলে অনেকেই সে দিকে ঝুঁকে থাকত। কেননা, সত্যের বিপক্ষ ও শত্রুপক্ষের সংখ্যা সবসময়েই বেশি ছিল। মোকাবিলা করার শক্তিদায়ক কোনো কিছু পাওয়া গেলে সেটাকেই তারা প্রচার করত। কেননা, তারা তুচ্ছ বাক-বিতণ্ডার জন্য অনেক কবিতা রচনা করত। সেগুলোকে তারা গৌরবগাঁথা কীর্তি সাব্যস্ত করত। তাহলে এটা কীভাবে সম্ভব যে, এ ধরনের আশ্চর্যজনক একটি প্রতিরোধ ঘটে যাবে, আর সেটা ইতিহাসের পাতায় গোপন থাকবে?